।আ।ত্ম।ক।থা।

এক জনমে অনেক বাঁক

পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার বাবাকে একবার এক ভন্ড সাধু ভগবান দেখাবে বলে সুদূর আসামে কামরুপ কামাক্ষায় ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো। এ গল্প একসময় আমাদের ফ্যামিলিতে খুব চালু ছিলো। এটা প্রায় আশি-নব্বই বছর আগের গল্প। বাবা তখন কিশোর। খুব দুরন্ত ও সাহসী ছিলেন। নইলে ঐ বয়সের কেউ মা-বাবা, ভাই-বোন ছেড়ে, আলু সেদ্ধ-ঘি-গরমভাতের টান ত্যাগ করে একা একা অত দূরে চলে যায়! ফরিদপুর থেকে লাল রঙের ট্রেন ভোর ভোর সময়ে ছেড়ে গিয়ে পড়ন্ত বেলায় কোলকাতা পৌঁছে যেতো। পথে রাজবাড়ী আর রানাঘাট জংশনে অন্যান্য স্টেশনের চাইতে একটু বেশি সময়ের জন্য দম নিতো লাল ট্রেনটা। স্টিম ইঞ্জিনটা তখন জল নিতো, কয়লা নিতো। রেলের ভাষায় 'শান্টিং' হতো। রানাঘাটে ভন্ড সাধুটি বাবাকে দেখিয়েছিলো দৈবশক্তিতে কিভাবে মানুষ তার মাথার সব চুল চকিতে তুলে ফেলতে পারে। সাধুটির চুলহীন ন্যাড়া মাথা দেখেও সরলপ্রাণ কিশোর সেদিন বুঝতে পারেনি সাধুটি আসলে পরচুলার ছদ্মবেশে একজন পাকা চোর, অর্থাৎ ছেলেধরা। বাবা নাকি কচুরি আর মন্ডা গোগ্রাসে গিলতে গিলতে ভেবেছিলেন, একদিন তিনিও সাধুটির মতো দৈবশক্তি অর্জন করে নিজের মাথার সব চুল খুলে ফেলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবেন। এসব পরিবারের গুরুজনদের মুখ থেকে শোনা। শুনতে শুনতে বড় হয়েছি। ছোটবেলায় আসাম দেখতে খুব ইচ্ছে করতো।

এর অনেক দিন পর, তখন আমি খুব ছোট। একজন সন্ন্যাসী ভিক্ষু মাঝেমধ্যই আমাদের বাড়িতে ভিক্ষা করতে এসে আমাকে দেখিয়ে মাকে বোলতো- 'এ ছেলেকে তুই ঘরে রাখতে পারবি না, ও সন্ন্যাসী হবেই।' এরপর থেকে মা আমাকে সারাক্ষণ আগলে রাখতেন। কে জানে ছেলে যদি সন্ন্যাসী ও গৃহত্যাগী হয়ে সত্যি সত্যি দূরে চলে যায়। আমার মা এখন স্বর্গবাসী। বেঁচে থাকাকালে মা সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত হতে পারেননি কখনো। যদিও জানতেন যে আমি জটাধারী সন্ন্যাসী হয়ে রাতবিরেতে শ্মশানঘাটে ছাইভস্ম গায়ে মেখে পড়ে থাকার মতো ভন্ড নই। তবুও ভয়, যদি শৈশবের সেই সন্ন্যাসী ভিক্ষুর কথা সত্যি সত্যি ফলে যায়। আমার ভেতরে যে একটা

'৭২ সালে যখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র

উড়নচন্ডি বাউন্ডুলে সত্তা আছে মা সেটা টের পেতেন। নিজের নাড়িকাটা জীবন না! আসলেই তো আমার ভেতর যেথা-সেথা উড়ে বেড়াবার মন ছিলো। এখনো আছে। যাকে ইংরেজিতে খুব ঘটা করে সবাই বলে বোহেমিয়ানিজম। এটা আমিও জানি। আজ পর্যন্ত কোনোখানেই থিতু হতে পারলাম না। আর এই অস্থির চঞ্চলতাই কি আমাকে অভিনয় জগতে নিয়ে এসেছে! কে জানে! হবে হয়তো!

ছোটবেলায় অসুস্থ শরীরে নিঃসঙ্গ জানালায় বসে নিঝুম সন্ধ্যালগ্নে পাখিদের কুলায় ফেরা দেখতে দেখতে ভাবতাম একদিন পাখি হয়ে সুদূরে হারাবো। আমার বাবার সঙ্গে ক্রিকেট খেলা দেখতে গিয়ে হানিফ মোহাম্মদ কিংবা গ্যারি সোবার্স হবারও স্বপ্ন দেখতাম। কলের গান কিংবা রেডিওতে গান শুনতে শুনতে কল্পনা কোরতাম হেমন্ত-শ্যামল-মান্না হবো। কিংবা শুক্রবারের রাতে আকাশবাণীর নাটক শুনে লেপের নিচে শুয়ে থেকে ভাবতাম আহা! যদি শম্ভুমিত্র হতে পারতাম। আজ দেখি কোনো কিছুই হতে পারিনি। হওয়ার চেষ্টায় আছি।

এক সময় বাংলাভাষী মধ্যবিত্ত সমাজকে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ করতেন উত্তম-সুচিত্রা, হেমন্ত-সন্ধ্যা, শরৎচন্দ্র এবং রবিঠাকুর। আমাদের এলাকায় আরো একজন অবশ্য নিয়ন্ত্রক ছিলেন তার নাম জসীমউদ্‌দীন। ফরিদপুর অঞ্চলে তিনি তখন এক জীবন্ত কিংবদন্তি। আমি শৈশবে তার 'কবর' কবিতা নকল করে একটা কবিতা লেখার চেষ্টাও করেছিলাম। পারিবারিক বন্ধু হওয়ায় পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের চাইতে তিনি আমার কাছে 'জসীমকাকু' হিসেবেই বেশি আপন ছিলেন। 'উড়ানির চর' দেখতে একবার কাউকে না বলে ট্রেনে চড়ে গোয়লন্দ চলে গেছিলাম। বছরে একবার কোলকাতা যাওয়া হোতো ফ্যামিলির সঙ্গে। মা'র নেশা ছিল থিয়েটার দেখা। বিশ্বরূপা, স্টার, মিনার্ভা ইত্যাদি নামগুলো শৈশবেই জানা হয়ে গিয়েছিলো। 'বিশ্বরূপায়' আমাকে কোলে নিয়ে মা 'শ্যামলী' নাটকটি দেখেছিলেন। যার নায়ক উত্তম কুমার আর নায়িকা ঢাকার মেয়ে সাবিত্রী। 'শ্যামলী' নাটকটি পরে যখন সিনেমা হলো, তখন নায়িকা পাল্টে গিয়ে কাবেরী বসু কাস্ট হয়েছিলেন। উত্তমের সাথে নাকি সাবিত্রীর মন কষাকষি চলছিল তাই।

এ সবই ছোটবেলাকার ঝাপসা স্মৃতি। ছোটবেলায় আমি খুব মুখচোরা ছিলাম। মানুষজন থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা কোরতাম সব সময়। তাতে লাভ হয়েছিলো একটা। বই পড়ার অভ্যেস হয়েছিলো। হাতের কাছে যা পেতাম তাই গোগ্রাসে গিলতাম। মায়ের আধা-পড়া দেবদাস-পরিণীতা-দত্তা-বিরাজবৌ কিংবা বিষবৃক্ষ-দুর্গেশনন্দিনী অথবা শেষের কবিতা-গোরা গল্পগুচ্ছ ইত্যাদি জাতীয় বই আমি খুব শৈশবেই বুঝে না বুঝে শেষ করেছি। যদিও বইগুলো আমাকে পরে বড় হয়েও আবার পড়তে হয়েছে- এখনো পড়তে হয়। তবে ঐ বইগুলো আমার ভেতর মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক, সম্পর্কের রসায়ন, বৈচিত্র্য ও বহুমাত্রিকতা ইত্যাদি বিষয়ে কিছু অনুভূতির জন্ম দিয়েছিলো। আমি সেই বয়সেই সিনিয়র নারী-পুরুষের মেলামেশা দেখে স্পষ্ট বুঝে ফেলতাম কোনোটা প্রেম, কোনোটা প্রেম নয়। এক ভর-সন্ধ্যায় লিচুতলার অন্ধকারে একজন সিনিয়র দাদার সঙ্গে পাড়ার সবচেয়ে লাজুক এক দিদিকে ঘনিষ্ঠ হতে দেখে বুঝেছিলাম ওটা প্রেম নয়, অন্যকিছু। ভর ভরন্ত যৌবনে এসে অবশ্য লিচুতলার ঐ দৃশ্য আমার কাছে অতি সাধারণ ও স্বাভাবিক একটি সাদা কাগজ। বুঝতে পারি না প্রেমই কি একেক বয়সে রঙ বদলায় নাকি আমাদের মন জানালা পাল্টায়!

এই সব বিষয় রঙ-বেরঙের শৈশব, বইপড়া গানশোনা, খেলা দেখা ইত্যাদি আমার অভিনেতা হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে ভীষণ কাজে লেগেছে। বাবার ভগবান দর্শনের গল্পটা কী জানি কেন এখনো আমাকে 'দূরে কোথায় দূরে দূরে' যাবার ইশারা দেয়। সারাক্ষণ কেবল দূরে যাবার তাগিদ আমার ভেতরে। একটা শুভ লক্ষণ। তার মানে আমি এখনো জীবন্ত আছি। আর একজন অভিনেতার জন্যে এই জীবন্ত থাকাটা খুবই জরুরি। নইলে তো সবাই বাঁধাকপি। আমার অভিনয় জীবনের পাইলিংয়ে আরো কয়েক পদের উপকরণের মিশেল আছে যা খুবই শক্তিশালী। যেমন বিশাল পদ্মানদী, বাঙালি জাতীয়তাবাদের আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধে আমাদের পরিবারের ত্যাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৈশোর উত্তীর্ণ প্রথম প্রেম। 'বড় প্রেম শুধু কাছেই টানে না দূরেও ঠেলিয়া দেয়।' এই উক্তিটি আমি জীবন দিয়ে জেনেছি। জীবন দিয়ে আরো কতো কিছুই জেনেছি। যে বন্ধুদের জন্যে ঝুঁকি নিয়ে মা-বাবা-ভাই-বোন ছেড়ে ঘরের বাইরে গেছি, সেই বন্ধুরা শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে যুদ্ধে যায়নি। ঘরে ফিরে আপসকামিতার চূড়ান্ত করেছে। অথচ দূরযাত্রায় ট্রেনের পাশের অচেনা যাত্রী যাকে আমি চিনি না, জানি না তিনি হাত ধরে গন্তব্যে পৌঁছে দিয়েছেন বন্ধুত্বের নির্ভরতা মাখা উষ্ণ মানসিকতা নিয়ে। বর্ডারের কাছাকাছি পৌঁছে একাত্তরের জুনে রক্তআমাশা আর তীব্র জ্বরে যখন মরতে বসেছিলাম তখন এক মসজিদের ইমাম সাহেব কোলে তুলে নিজ ঘরে নিয়ে চিকিৎসা করিয়েছেন, শুশ্রূষা করেছেন। জীবনে কে যে কখন আপন, কে যে পর হয়ে যায় বোঝা

Avd‡ivRv ebi m‡½ †`‡ki c_g wfDKv‡W

মুশকিল। এসবই আমার জীবন থেকে নেয়া শক্তি। যার আরেক নাম আত্মবিশ্বাস। একজন অভিনেতা হতে হলে অন্যের প্রতি আস্থা আর আত্মবিশ্বাস খুবই জরুরি।

দুই

সেটে শুয়ে থাকার কোনো দৃশ্য থাকলে আমি প্রায়ই ঘুমিয়ে পড়ি। যেমন ধরুন একটা দৃশ্য হবে এ রকম, যেখানে আমি অসুস্থ। শট টেক করা হবে, লাইট-ক্যামেরা ঠিকঠাক করা হচ্ছে, ডিরেক্টর মনিটর সেটের সামনে বসে মনযোগ দিয়ে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি দেখে নিচ্ছেন, আমিও শট দেবার জন্যে চোখ বুজে বিছানায় শুয়ে আছি সব ঠিকঠাক-অল কোয়াইট, রোলিং-ফাইভ, ফোর, থ্রি, টু, ওয়ান-অ্যাকশন-ক্যামেরা কাজ শুরু করেছে কিন্তু হঠাৎ পুরো সেটের উপস্থিত সবাই হো হো হেসে উঠলো। কারণ, আমি সত্যি সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছি। কী লজ্জা, কী লজ্জা! একবার ঘুমন্ত অবস্থায় শট চলাকালে খাট ভেঙে পড়ে গিয়েছিলাম। দৃশ্যটি ছিল এই রকম, আমি ঘুমিয়ে আছি অসুস্থ শরীর নিয়ে- মা এসে খাটে আমার পাশে বসে ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা করবেন এবং শরীরে জ্বর অনুভব করে ঘাবড়ে যাবেন। আমি যথারীতি শট দিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি। আমার মায়ের চরিত্রে অভিনয় করছিলেন রওশন জামিল। তিনি এসে আমার পাশে বসে আমাকে তুলতে গিয়ে ঘুম ভাঙাবার জন্য জোরে জোরে দু'তিনবার ধাক্কা দিলেন। আর অমনি মাসহ আমি খাট ভেঙে নিচে পড়ে গেলাম। আবার সেটশুদ্ধ সবার হাসির রোল।

রওশন জামিল একজন অসাধারণ অভিনেত্রী ছিলেন। মানুষ হিসেবে ছিলেন খুবই সাধারণ। তাকে আমি 'সকাল-সন্ধ্যা'র পর থেকে নিয়মিতভাবে মা বলেই সম্বোধন করতাম। আমার সত্যিকারের মা সান্ত্বনা বন্দ্যোপাধ্যায় রওশন জামিলকে ঈর্ষা করতেন। অনেকটা যেন সতীনই মনে করতেন। এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা বলি। মা একবার বেনাপোল বর্ডার দিয়ে কোলকাতা থেকে আসছিলেন। তখন বর্ডারে খুব কড়াকড়ি চলছিলো। ইমিগ্রেশনে জিজ্ঞাসাবাদের এক পর্যায়ে মা বললেন, তার বড়ছেলের নাম পীযূষ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইমিগ্রেশনের লোকজন বিশ্বাস করেন না। তারা বলেন, পীযূষের মার নাম রওশন জামিল। মা তখন ব্যাগ থেকে আমার একখানা ছবি (যেখানে আমার সঙ্গে মাও ছিলেন) দেখিয়ে সবাইকে বিশ্বাস করাতে পেরেছিলেন এবং অতিরিক্ত আদরযত্নও পেয়েছিলেন। রওশন জামিলের প্রতি আমার মায়ের সতীন-সুলভ মনোভাব একেবারে যুক্তিহীন নয়। আমার নাটকের মা আর সত্যিকারের মায়ের কোনোদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। তবে বেঁচে থাকাকালে দু'জনেই দু'জনার খোঁজখবর নিতেন আমার কাছ থেকে। আমার মায়ের কিঞ্চিত অনুযোগ ছিল, আমি নাকি অভিনয়ের সময় নাটকের মাকে যেভাবে 'মা' বলে সম্বোধন করি সেভাবে তাকে ডাকি না। জানতাম এসব হচ্ছে বার্ধক্যকালীন শিশুসুলভ অভিমান। তবু এ কথা শুনে কষ্ট তো একটু আমারও হতো। মনে মনে ভাবতাম, নাটকের 'মা' ডাকে আছে শতভাগ কৃত্রিমতা, নিজের মাকে 'মা' ডাকার সময় যার বিন্দুমাত্র চিহ্নও থাকে না।

ফিরে আসি আমার কথায়। এক অর্থে আমি খুবই সৌভাগ্যবান। আমি সব মাধ্যমেই অভিনয় করেছি। মঞ্চ-রেডিও-টেলিভিশন-চলচ্চিত্র-পথনাটক। কেবল যাত্রায় কাজ করা হয়নি। এখন তো যাত্রাই নেই, ইচ্ছে থাকলেও আর কাজ করা যাবে না। পুরনো যাত্রার কাল যদি থাকতো তবে নিশ্চিত যে যাত্রায় অভিনয় করতামই। একবার '৭৩-৭৪ সালে ডাক পেয়েছিলাম মাসিক পাঁচ হাজার টাকা ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য প্রচলিত সুবিধার বিনিময়ে। ঢাকা থিয়েটার নিয়ে তখন এতোই মগ্ন ছিলাম যে সেই ডাকে সাড়া দিতে পারিনি। থিয়েটার ছাড়তে হবে বলে আমি বাংলাদেশ বেতারের আকর্ষণীয় চাকরিতেও পর্যন্ত যোগ দেইনি। কারণ প্রোগ্রাম অর্গানাইজার হিসেবে পোস্টিং হয়েছিলো ঢাকার বাইরে রংপুরে।

আমার অভিনয় জীবনের পর্ব দু'টি। একাত্তর-পূর্ববর্তী, অপরটি একাত্তর-পরবর্তী। প্রথম পর্বে শুধুই সৌখিন থিয়েটার। রাজবাড়ী আর ফরিদপুরে সেই পর্বের যত কিছু। তখন নাট্যকার কল্যাণ মিত্রের খুব নামডাক। মফস্বল শহরগুলোর স্কুল-কলেজ-পাড়া-মহল্লায় তার নাটকও হতো নিয়মিত। আর নাটক চলাকালে মঞ্চে অভিনেতা-অভিনেত্রীকে লক্ষ্য করে ডিম-

টমেটো ইত্যাদি ছুঁড়ে মারার এক হাস্যকর খেলায় মেতে উঠতো শহরের কিছু দুষ্ট লোক। দর্শকের মধ্যে ভালোমানুষের মতো বসে থাকতো তারা। তারপর ঝোপ বুঝে কোপ দেবার মতো সুযোগ পেলেই পচা ডিম-টমেটো ছুঁড়ে মারতো মঞ্চের দিকে। একবার বেশ একখানা রোমান্টিক সিনে অভিনয় করছি, হঠাৎ পচা ডিম এসে পড়লো নায়িকার পায়ের কাছে। ঘাবড়ে গেলাম। পুরু মেক আপের আড়ালেও ভয়ার্ত ছায়া স্পষ্ট হলো নায়িকার চোখেমুখে। দ্বিতীয় ডিমটি আসছিলো আমার নাক বরাবর। সজাগ ষষ্ঠইন্দ্রিয়ের ফলে বিশ্বসেরা ফিল্ডারের মতো ক্যাচ ধরে ফেললাম। নাটক সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে গেলো। উদ্যোক্তাদের এক বড়ভাই মঞ্চে এসে যেই না খুব কড়া ভাষায় দর্শকদের বকাঝকা শুরু করলেন, অমনি শুরু হলো মুষলধারে ডিম্ববৃষ্টি। উদ্যোক্তা বড়ভাই মঞ্চ থেকে কোনো রকমে পালিয়ে বাঁচলেন। সমস্ত কাপড়চোপড়ে তখন পচা ডিমের দাগ ও দুর্গন্ধ। ডিম-টমেটো, এমনকি গোলাপফুলও মঞ্চে ছোঁড়া হয়নি। কারণ মিলনায়তনের প্রতিটি কোনায় আমাদের নিজস্ব কর্মী মোতায়েন করা হয়েছিলো আগে থেকেই। দুষ্ট লোকদের ডিম তাদের পকেটেই নষ্ট হয়েছে সেবার। শহরে তখন এটা একটা ঐতিহাসিক ঘটনা। নাটক শেষে পরপর তিন দিন নায়কের পোশাক গা থেকে সরাইনি। কলেজের ক্যান্টিন-কমনরুমে বিশেষ করে মেয়েদের কমনরুমের জানালার কাছ দিয়ে নাটকের পোশাক পরে বন্ধুদের নিয়ে হেলেদুলে কয়েক পাক ঘুরে আসতাম। জানালা দিয়ে ঝরে পড়তো নারীকণ্ঠের খিলখিল হাসি অথবা নাটকের দু-একটি চটুল সংলাপ। বাতাসে চুল এলোমেলো হয়ে যেতো বলে পকেটে রঙিন চিরুনি রাখতাম। 'এলো চুলেই তুমি সুন্দর'- এ রকম মিষ্টি কথা একবার শোনার পর থেকে জীবনেও আর পকেটে চিরুনি রাখি না। কেশহীন অভিনেতাদের দেখেছি পকেটে খুব বড় আকৃতির চিরুনি রাখতে। আমি মনে মনে বলি- ওরা তো

শওকত আলীর গল্প অবলম্বনে 'যাত্রা' নাটকের একটি দৃশ্য

এইসব পাকিস্তান আমলের কথা। মুসলিম লীগের একটি দাঙ্গাবাজ ছাত্র সংগঠন ছিল 'এনএসএফ'। সংস্কৃতি চর্চার সাথে এই সংগঠনের কোনোই সংস্পর্শ ছিল না। শহরের সকল ভালো কাজ, কাজের উদ্যোগ নষ্ট করতে এরা ছিল ওস্তাদ। ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের জোয়ারে এরা যে কোথায় ভেসে গেলো। দুই বছর পরে অবশ্য মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় এরাই আবার সর্বাগ্রে পাকি সেনাদের পক্ষে দালালি শুরু করে। 'এনএসএফ' নেই, কিন্তু তার অপচ্ছায়া এখনো রয়ে গেছে। পঁচা ডিম ছোঁড়ার কালচার সরে গিয়ে এসেছে বোমা মারার কালচার।

শৌখিন থিয়েটার জীবনের একটি ছোট্ট কথা বলে এই পর্ব শেষ করবো। যেবার প্রথম আমি রাজেন্দ্র কলেজের বার্ষিক নাটকে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করলাম সেবার নাটক চলাকালে চুল আঁচড়ায় না, ওরা মাথা আঁচড়ায়। এ ক্ষেত্রে হায়াত ভাই ব্যতিক্রম। হায়াত ভাইয়ের পকেটে আমি কখনো চিরুনি দেখিনি। আসলে কেশহীন আবুল হায়াত ভারী সুন্দর। যেমন প্রিন্স করিম আগা খান, গরবাচেভ, অনুপম খের সুন্দর। কেশহীন ইউল ব্রায়নার তো ছিলেন সুপারহিট স্টার। 'দি কিং অ্যান্ড আই' সিনেমাটি যারা দেখেছেন তারা নিশ্চয় আমার সাথে একমত হবেন। হায়! পৃথিবীজুড়ে কোথাও টাকমাথা জনপ্রিয় মহিলা শিল্পীর অস্তিত্ব নেই। পূর্ণাঙ্গ টাকমাথা নারী কি কেউ কোনোদিন দেখেছেন? আমি দেখিনি।

তিন

পৃথিবীতে টেলিভিশন অনুষ্ঠান চালু হয়েছে বোধহয় ছেষট্টি বছর। এ দেশের মানুষের টিভি দেখার অভিজ্ঞতা চল্লিশ বছরের বেশি। আমি টিভিতে অভিনয় করি প্রায় বত্রিশ বছর ধরে। চৌষট্টি সালে ঢাকায় যখন টিভি স্টেশন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন আমি চৌদ্দ বছরের নবীন কিশোর। থাকি রাজবাড়ী নামের এক মফস্বল শহরে। কয়েক কিলোমিটার দূর দিয়ে বয়ে গেছে প্রমত্তা পদ্মা নদী। শহরের কারো বাড়িতে টিভি সেট ছিল না। ঢাকার চাইতে কোলকাতার সাথে এই শহরের বেশি ঘনিষ্ঠতা ছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যার পরপরই কোলকাতার দৈনিক পত্রিকা শহরে চলে আসতো। ঢাকার পত্রিকা পৌঁছাতে দিন ও রাত দুটোই পেরিয়ে যেতো। এই রাজবাড়ীতে আমি সিনেমার প্রেমে পড়ি। সুচিত্রা সেনের পর পর্দায় যদি কারো মুখ দেখে তখন আমার বুক কেঁপে থাকে তার নাম কবরী। 'সুতরাং' ছবিটা দেখে আমি পর্দার কবরীকে নিয়ে অনেক ভেবেছি। পরে বিটিভিতে মধ্য আশিতে তার সঙ্গে একটা দীর্ঘ নাটক করেছিলাম। যেখানে কবরী একজন জনপ্রিয় স্টার এবং আমি একজন সিনে সাংবাদিক। দু'জনের প্রেম শেষ পর্যন্ত সফল হয় না। ঐ নাটকে অভিনয় করার সময় কবরীর চোখ-নাক-ঠোঁটের দিকে গভীরভাবে তাকিয়েছি সত্য। কিন্তু অনেকটা পথ পেরিয়ে এসে কৈশোর অথবা প্রথম যৌবনের আবেগ আর তখন নেই। থাকলেই বা কী হতো? কবরী কি আমার প্রেমে পড়তেন! কবরীর সঙ্গে এখনো সুন্দর সম্পর্ক আমার।

চলচ্চিত্রের আরো একজন নায়িকাকে আমার খুব ভালো লাগতো। তার ডাক নাম পপি, আমজনতার কাছে যিনি ববিতা নামে জনপ্রিয়। খুবই গুণী শিল্পী। সত্যজিৎ রায়ের 'অশনি সংকেত' সিনেমায় নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। বন্ধু ইকবালের (প্রয়াত জাফর ইকবাল) মাধ্যমে একবার এই রূপসী নায়িকার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম কক্সবাজারে। ওরা দু'জনে সেখানে শুটিং করেছিলেন 'হারজিৎ' ছবির। তখন আমাকে চেনেই বা কে! কক্সবাজারও তখন একেবারে ভিন্ন চেহারার। এখনকার সঙ্গে যার কোনো মিলই হয় না। সত্তর দশকে যখন চলচ্চিত্র সংসদ কর্মকান্ডে প্রত্যক্ষ জড়িত ছিলাম তখন শুনতাম সংসদের এক সিনিয়র কর্মীর সঙ্গে ববিতার খুব হৃদ্যতা। সিনিয়র ভাইটি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, এখন প্রথম সারির রাজনীতিবিদ। ভদ্রলোকের তখন শ্মশ্রুমন্ডিত লম্বা চুলের চেহারা ছিল, এখনো তাই। একবার আজাচৌ (আহমদ জামান চৌধুরী)-এর সঙ্গে 'বাদী থেকে বেগম' ছবির সেটে গিয়ে বেগমরূপী নৃত্যরতা ববিতাকে দেখে ঝলসে গিয়েছিলাম। যেমন রূপ আর যেমন সাজগোজ- ঝলসে যাওয়া বলা তো কমই হলো। বরং বলা দরকার পুড়ে গিয়েছিলাম। প্রদীপ শিখায় পতঙ্গ যেমন উড়ে উড়ে পুড়ে যায়। এ রকম ভাব নিয়ে একটা দারুণ হিন্দি গান আছে।

এই ঝকঝকে ববিতার সঙ্গে একবার আমি প্রায় দু'সপ্তাহ একত্রে কাটাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। সেটা সম্ভবত চুরাশি সালের ডিসেম্বরে। কায়রো ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আমন্ত্রিত

হয়ে আমরা মিসর গিয়েছিলাম। চিত্রগ্রাহক-পরিচালক রফিক ভাই (রফিকুল বারী চৌধুরী) আমিন্ত্রত হয়েও কায়রো যেতে পারেননি। ঝলমলে শাড়ি আর রাজসিক সাজসজ্জায় ববিতা কায়রো ফেস্টিভ্যালের মহারানী হয়ে উঠেছিলেন। রাস্তায় ঘুরতে বের হলে মিসরীয়রা তাকে বলতো 'হিন্দি'। অর্থাৎ হিন্দুস্তানি। কারণ শাড়ি পরিহিত নারী মাত্রই তাদের কাছে হিন্দুস্তানি অর্থাৎ ভারতীয়। রেখা আর অমিতাভ তখন সমস্ত মিসরে ভীষণ জনপ্রিয়। কায়রোতে ভালো সিনেমা তৈরি না হলেও, কায়রোর বেশ কিছু ধনাঢ্য ব্যক্তি হলিউডে সিনেমা প্রযোজনা করেন। এই রকম এক ধনাঢ্য প্রযোজক ববিতার সম্মানে পার্টি দিলেন গিজা-সাকারার মরুভূমিতে পিরামিডের গা ঘেঁষে এক মরুদ্যানের ভেতর। চাঁদ ছিল সেদিন। জ্যোৎস্নামত্ত পার্টিতে উদ্দাম নৃত্য ছিল, মিসরীয় সঙ্গীতের উচ্ছল সুর ও সুরধারা ছিল। ইরাকের জনপ্রিয় নায়ক মেহমুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে মিসরীয় লোকনৃত্যের একটি ফর্মকে হুবহু নকল করতে গিয়ে স্যুটের নিচের অংশে প্যান্টের সেলাই ফটাশ করে ছিঁড়ে গেলো। প্রায় অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থা আমার। এক রোমানিয়ান নায়িকা সেদিন তার গায়ের স্কার্ফটা খুলে না দিলে বেইজ্জতি হতে হতো। রোমানীয় সেই সুন্দরীর নাম মনে নেই, চেহারাও মনে নেই। তবে স্মৃতিটুকু আছে। ইরাক থেকে আসা উজ্জ্বল নায়ক মেহমুদের জন্যে আমি অনেক দুশ্চিন্তা করেছি গত যুদ্ধের সময়। ওর সঙ্গে আমার শেষ যোগাযোগ কুয়েত-ইরাক যুদ্ধের পর। কে জানে মেহমুদ এখন কেমন আছে! আদৌ আছে কি! মেহমুদ আমাকে ব্যাবিলনের গল্প শোনাতো, কারবালার গল্প শোনাতো। তার প্রেয়সীর কথা বলতো। মিসরের স্মৃতি মনে পড়লেই ফাতিমার মুখ মনে আসে। ইজিপ্ট এয়ারের বিমানবালা। ফাতিমাই আমাকে প্রথম বলেছিলো, 'ইউ লুক লাইক ইজিপশিয়ান।' আসলেই মিসরীয়দের গায়ের রঙ, চুল, চেহারাকৃতি অনেকটা আমার মতোই। সুন্দরী ক্লিওপেট্রাও আমাদের দেশের মেয়েদের মতোই শ্যামলা ছিলেন।

তো ফিরে আসি ববিতায়। আমরা, ফেস্টিভ্যালের সমস্ত অতিথিরা থাকতাম নীল নদের পাড়ে একটা সদৃশ্য পাঁচতারা হোটেলে।

wgk‡ii mvKviv gi“fwg‡Z cw_ex weL¨vZ GK wùsm-Gi mvg‡b Awf‡bÎx eweZvi m‡½

বিশাল হোটেল, অনবদ্য অ্যারেঞ্জমেন্ট। আমাদের শেরাটন-সোনারগাঁও ঐ হোটেলটির তুলনায় অনেক পিছিয়ে। উৎসবের কমন প্রোগ্রামের বাইরেও আমরা দু'জন নিজেদের মতো ঘুরেছি, পিরামিড দেখেছি, কেনাকাটা করেছি, সুদূর আলেজান্দ্রিয়ায় গেছি। কত কথা, কত স্মৃতি, কত ভালোলাগা একসাথে ভাগেজোগে অনুভব করেছি। ববিতা ঢাকা ফিরে এলেন আমার আগে। আসার আগের রাত আমরা একসঙ্গে ডিনার করলাম অনেক সময় ধরে। জীবনে কোনো কোনো মুহূর্ত হঠাৎ করে আগে থেকে জানান না দিয়েই চলে আসে যখন 'নারী উন্মুক্ত করে তার ধন-ধান্যের দুয়ার'। সেই রাতে আমি জানলাম নারীর ভেতর একটা নদী আছে। নদীটার নাম দুঃখ। দুঃখ-নদীতে কখনই চর পড়ে না। সতত বহমান দুঃখ নদী নারীকে ভারী আকর্ষণীয় করে তোলে।

আমার প্রথম বাণিজ্যিক ছবির সহঅভিনেত্রীও ছিলেন ববিতা। কক্সবাজারে ছবির শুটিংয়ের দিনে ছিল সমুদ্রপাড়ে গানের পিকচারাইজেশন। একটি শটে ববিতাকে জড়িয়ে ধরে উঁচু করে তুলতে গিয়ে কোমরে ব্যথা পেয়েছিলাম। ব্যথাটি এখনো মাঝেমাঝেই আমাকে ভোগায়। আমার এই ব্যথাটিকে চিকিৎসকেরা বলেন 'স্লিপ ডিস্ক'। বাণিজ্যিক ঐ ছবিটার নাম 'মহামিলন।' প্রয়াত দিলীপ সোম পরিচালিত 'মহামিলন' ছবিটিতে কাজ করে আমি চুক্তিবদ্ধ পারিশ্রমিক পুরোপুরিই পেয়েছিলাম। আর কোনো ছবির জন্যে আমি কোনোদিন সম্পূর্ণ পারিশ্রমিক পাইনি। কোনো কোনো ছবির জন্যে তো যাতায়াত খরচও হাতে আসেনি। এই বোধ হয় আমাদের চলচ্চিত্র শিল্পের স্বাভাবিক সংস্কৃতি। শুধু চলচ্চিত্রের কথা বলছি কেন, এই সংস্কৃতি এখন নাটকের ক্ষেত্রেও শুরু হয়েছে। হবে নাই বা কেন, এই লাইনে দুই নম্বরী লোক ঢুকে পড়েছে যে। 'যার নাই কোনো কাজ সেই হয় প্যাকেজবাজ।' এক রসিকের মন্তব্য।

চার

একবার টঙ্গী গেছি ক্লায়েন্ট সার্ভিসে। তখন আমি নান্দনিক বিজ্ঞাপনী সংস্থার এক্সিকিউটিভ। এখনকার মতো ইয়েলো ক্যাব ছিল না। বাস কিংবা বেবিট্যাক্সির জন্যে অপেক্ষা করতে করতে ক্লান্ত প্রায়। হঠাৎ দেখলাম এক যুবক আমার বাহু এবং ঘাড় টিপে টিপে দেখছে। ব্যাপার কি! ঘাবড়ে গেলাম। হচ্ছেটা কি! যুবকটি টেপাটেপি শেষে নিজের মতো চলে যেতে যেতে বললো 'সলিড বডি'। আর একবার রাজশাহীতে ভিড়ের মধ্যে অনেকেই আমার চুল টেনে বুঝবার চেষ্টা করছিলো, চুলগুলো আসল না নকল। এ সবই একধরনের ইলিউশন থেকে হয়। আজ বুঝি, তখন বুঝতাম না। একবার ঢাকার বাইরে এক বনেদী শহরে পাবলিকের হাত থেকে বাঁচাতে

আমার জন্যে পুলিশ আনা হলো। ভিড়কে নিয়ন্ত্রণ করে পুলিশ অফিসার তার গাড়িতে নিয়ে তুললেন। তারপর আমাকে আমার গন্তব্যে পৌঁছে না দিয়ে উপরোল্লিখিত পুলিশ ভদ্রলোক নিয়ে গেলেন সোজা তার নিজস্ব ফ্ল্যাটে। ব্যাপার কি! না তিনি সদ্য বিবাহিত স্ত্রীকে একবার দেখাতে চান যে আমার সঙ্গে তার পরিচয় আছে। এসব অভিজ্ঞতা সত্যি বলছি, আমাকে ঋদ্ধ করেনি। কিছু অভিজ্ঞতা মানুষকে ঋদ্ধ করে না। বরং জীবনে ঝামেলা বাড়ায়। তাকে না রাখা যায় বেনারসির মতো নেপথোলিন দিয়ে ভাঁজ করে ওয়ারড্রোবে, না তাকে কমোডে ফেলে ফ্লাশ করে নিশ্চিহ্ন করা যায়। কিছু অভিজ্ঞতা কিন্তু বেশ ইন্টারেস্টিং। একবার নাটকের রিহার্সেল সেরে রামপুরা টিভি স্টেশন থেকে রিকশায় ফেরছি। সঙ্গে বেলী অর্থাৎ আফরোজা বানু। খিলগাঁওয়ের কাছে দুই যুবক আমাদের শুনিয়ে মন্তব্য করলো- 'চলন্ত ভিউকার্ড'। রসিক যুবকদ্বয়ের মন্তব্যে না হেসে পারলাম না। তখন ঢাকায় তথা বাংলাদেশে ভিউকার্ড সবেমাত্র বাজারে এসেছে এবং তার বেশির ভাগই বেলীর আমার 'সকাল-সন্ধ্যা' নাটকের ছবি নিয়ে। আমাদের সেই ভিউকার্ড তখন ধুমসে বিক্রি হচ্ছে দেশজুড়ে। খুলনায় দেখেছিলাম পঞ্চাশ-ষাট পয়সার একটা ভিউকার্ড বিক্রি হচ্ছে পঁচিশ টাকায়। এটা প্রায় বাইশ-তেইশ বছর আগের কথা। আজকের আজাদ প্রোডাক্টসের রমরমা ব্যবসার শুরু তখন থেকেই। আজকের ধনাঢ্য ব্যবসায়ী আবুল কালাম আজাদের ধনী হওয়ার প্রথম সফল সোপান ছিল সেই সময়কার ভিউকার্ড ব্যবসা। আজাদের সৎ স্বীকারোক্তিতেও এই কথা অনেকেই জানে। ভিউকার্ড বাণিজ্যে আজাদের কপাল খুলে গেছে, কিন্তু আমি যেখানে ছিলাম প্রায় সেখানেই রয়ে গেছি। অনেকের ধারণা এমন যে, ভিউকার্ড বাণিজ্যে আমিও বোধ হয় প্রচুর লাভবান হয়েছিলাম। আসলে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে এই রকম ভাবনা সবাই ভাবে। যে ছবি সুপারহিট হয় তার লাভ প্রযোজকের পকেটেই যায়, অভিনেতার নয়। একবার ট্রেনে চট্টগ্রাম থেকে ফিরেছি। কম্পার্টমেন্টে সিনিয়র-জুনিয়র মিলে বেশ ক'জন আর্মি অফিসার ছিলেন। একজন জুনিয়র অফিসার (তখন সম্ভবত ক্যাপ্টেন) বিশ্বাসই করতে চাইলেন না যে আমার নিজস্ব গাড়ি নেই, বাড়ি নেই। কমলাপুর স্টেশনে নেমে তাকে নিয়ে বেবিট্যাক্সিতে চড়ে বাসায় গেলাম, রুটি-সবজি চা দিয়ে সাধারণ মধ্যবিত্তের মতো নাশতা করলাম। তবুও কি তার বিশ্বাস হয়! পরে অবশ্য সেই জুনিয়র অফিসারটি আমার খুব কাছের মানুষ হয়ে গেছেন।

জীবনের অনেকটা পথই চলে এসেছি। কি পেয়েছি আর কি পাইনি তার হিসাব তো তেমনভাবে এখনো করা হয়নি। করতে চাইও না। অভিনয় জীবনের অংশেও তো অনেক হিসাব-নিকাশ আছে। সেই হিসাবের অঙ্ক আসলে সত্যি বলতে কি আমি কষতে চাই না। কী লাভ! ক্ষতিইবা মানতে চাইবো কেন! আমার তো কোনো ক্ষতি হয়নি। আমি তো সবার কাছ থেকে চুকচুক করে শিক্ষা চুষে খেয়েছি। সমরেশদা (সমরেশ বসু) বলেছিলেন, 'আমার অথিক গুরু, বেথিক গুরু, গুরু অগণন।' শ্যামলদা (শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়) বলেছিলেন, 'পকেটে একটা তিন নম্বর বাড়তি চোখ রাখবি সব সময়। সেই চোখ দিয়ে যা কিছু দেখবি সব গুছিয়ে রাখবি আলমারিতে। তারপর একদিন সময় মতো মঞ্চের সাদা কাগজে সেই সব দেখা জিনিসের ছবি আঁকবি।' শম্ভু মিত্র বলেছিলেন, 'স্বর্ণকণ্ঠ! গলাটাকে যত্ন করে রাখবে।' পত্রীদা (পূর্ণেন্দ পত্রী) বলেছিলেন, 'হুইস্কি কম খাবি। ভুলে যাবি না যে দেহপট সনে নট সকলি হারায়।' ফণিমনসা নাটকের অভিনয় দেখে পটুয়া কামরুল হাসান একটা ছবি উপহার দিয়েছিলেন। ছবিটা খোয়া যাবার দুঃখ নিয়ে আজো চলাফেরা করি। ইলিয়াস ভাই (আখতারুজ্জামান) বলেছিলেন, 'আপনাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। আপনি একটা মূর্খ। মূর্খ না হলে কেউ দ্বিতীয় বিবাহ করে।' এরা সবাই আমার নমস্য, গুরু। রিকশাওয়ালা নৌকার মাঝি, মাজারের খাদেম, মাতাল-তাড়িখোর- এদের কাছ থেকেও কি কম পেয়েছি! একবার এক রিকশাওয়ালা হরদেও গ্লাস ফ্যাক্টরির কাছ থেকে মধ্যরাতে ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে পৌঁছে দিয়ে একটা পয়সাও ভাড়া নিলো না। বলে গেলো 'আরো ভালো অ্যাকটিং করবেন।' একবার এক লঞ্চের সারেংকে কথা দিয়েছিলাম তার জীবন নিয়ে নাটক করবো। করা হয়নি। এক মৃত্যুপথযাত্রীর বড় ভাই এসে একদিন আমাকে বললেন যে তার ছোট বোনটা মৃত্যুর আগে আমাকে দেখত চায়। পরদিন যাবো বলে কথাও দিলাম । কিন্তু...। আমার জীবনে এই অচেনা-অদেখা মৃত বোনটির কোনো হিসাব নেই? কী উত্তর দেবো। রাসেল নামে এক রিকশাচালক আমাকে 'নূরলদিনের সারা জীবন' নাটকের অনেকখানি রিকশা চালাতে চালাতে মুখস্থ শুনিয়ে দিলো। আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, ওর জন্যে কিছু করবো। কিন্তু করা হয়নি। শৈশবের হেদু কাজীকে ভেঙেচুড়ে নিজের মতো বিনির্মাণ করলাম 'কিত্তনখোলা' নাটকের ইদুকনকদারে। বাচ্চু (নাসির উদ্দিন ইউসুফ) শিখিয়েছেন- কি করে বিজ্ঞানমনস্ক ও যৌক্তিকভাবে অভিনয়কে শিল্পের কাছাকাছি নেয়া যায়। আমি পারিনি। সেলিম আলদীনের কাছে শিখছি দ্বৈতাদ্বৈত বাদ দর্শন। যামিনী জ্যাঠামশায় শেখাতেন গুহ্যদ্বার-তলপেট-নাভিমূল থেকে কিভাবে শব্দ তুলে এনে কণ্ঠে খেলাতে হয়। অভিনেতা যামিনী লাহিড়ী ঘোর প্রত্যুষে গলাজলে নেমে প্রথম রেওয়াজ ও পরে সূর্যপ্রণাম করতেন। তাঁর সেই জলদগম্ভীর স্বরের উচ্চারিত মন্ত্র আমরা মুগ্ধ হয়ে শুনতাম। 'আজি এ প্রভাতে রবির কর' কিংবা 'মরণের তুঁহু মম শ্যাম সমান'। কিংবা শাহজাহান কবিতার আবৃত্তি আমি কোনোদিন আর অন্য কণ্ঠে শুনে খুশি হবো না, হইনি। 'তরুণ জামিল আহমেদ দিল্লী থেকে থিয়েটারের পাঠ শেষ করে এসে গ্রুপে ওয়ার্কশপ করলো। তখনই প্রথম জানলাম 'রেসোনেন্স' বলে একটা শব্দ আছে যা বাচিক অভিনয়ের জন্যে প্রয়োজনীয়। এই যে এতোভাবে শেখা, এতোজনের কাছে শেখা- সবাই তো আমার অভিনয় জীবনকে সমৃদ্ধ করেছে, করছে। সমরেশদার সেই 'অথিক গুরু বেথিক গুরু' তত্ত্বকে খুবই সত্য মনে হয় আমার জীবনে। আমার জীবনের সবচেয়ে বড় স্কুলটির নাম 'চুয়ান্ন বছরের জীবন'। আমি দেখে শিখেছি, ঠেকে শিখেছি, ঠকে শিখেছি, মানুষের সঙ্গে মিশে শিখেছি। পড়ে শেখার অভিজ্ঞতা আমার অনেকের মতো নেই। তাইতো পিটার ব্রুক-গ্রোটোস্কি-মলিয়ঁর-ব্রেশট-স্তানোস্লাভাস্কি নিয়ে তুমুল আলোচনায় আমি চুপ মেরে থাকি। অ্যানসেন্ট গ্রিক থিয়েটার, রোমান থিয়েটার, মেডিয়াভ্যাল থিয়েটার, ইটালিয়ান রেনেসাঁ কিংবা ফ্রেঞ্চ ক্লাসিসিজম অথবা সিম্বোলিজম-এক্সপ্রেশনিজম এবং রিয়ালিজম ও নিউট্রালিজম ইত্যাদি নিয়ে যখন তার্কিকগণ তুমুল তর্ক করেন,

'৮৫ সালে যেদিন আমরা সন্ধানীকে প্রথম একসঙ্গে রক্তদান করলাম। ফরীদি, আসাদ ও আমি

বক্তৃতাবাজি করেন তখন আমি সেসব শুনতে শুনতে চোখ বুজে ঝিমাই। তবে আমি দেশ-বিদেশের থিয়েটার প্রয়োজনা নিয়মিত দেখি। আমি প্র্যাকটিসে বিশ্বাস করি যে। তত্ত্বে ও অহেতুক আত্মপ্রচারের তর্কে নয়।

'৯৫-তে ফরিদপুরের বাড়ির সামনে মা ও আমি

পাঁচ

বলেছিলাম আমি খুবই ভাগ্যবান এই জন্যে যে আমি যাত্রা ছাড়া সব মাধ্যমেই অভিনয় করার সুযোগ পেয়েছি। তবে নিঃসন্দেহে আমার পরিচিতির গন্ডি বাড়িয়েছে টেলিভিশন। তাই বলে টেলিভিশনের জন্যে আমার বাড়তি পক্ষপাতিত্ব নেই। কারণ টেলিভিশনকে আমি সিনেমা এবং থিয়েটারের মতো মৌলিক মাধ্যম মনে করি না। কিন্তু এটা বিশ্বাস করি, তাৎক্ষণিক শিক্ষাদান কিংবা দ্রুত তথ্য পৌছানোর জন্য টেলিভিশনের বিকল্প মাধ্যম আজ আর নেই। এই অভিজ্ঞতা আমার আছে।

একটি-দু'টি বলার চেষ্টা করি বরং। বিটিভিতে প্রচারিত একটি সিরিয়ালের কোনো এক পর্বের শেষটা ছিল এই রকম, যেখানে আমি একজন সরকারি চাকরিজীবী হয়ে মোটা অঙ্কের ঘুষ গ্রহণ করবো কি করবো না! সিদ্ধান্তহীনভাবেই পর্বটি শেষ হয়। পরদিন সকালে বাসায় দুই ভদ্রলোক এসে গোপনে এবং অতি সন্তর্পণে আমার কাছে জানতে চাইলেন, পরবর্তী পর্বে সত্যি সত্যি আমি ঘুষ গ্রহণ করবো কি না। তারা দু'জনই সচিবালয়ে চাকরি করেন এবং তারা নাটকের মতোই সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছেন। তাদের হাতের কাছেই রয়েছে বেশ মোটা অঙ্কের ঘুষের অফার কিন্তু তাদের মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ সেই ঘুষ গ্রহণে সায় দিচ্ছে না। ভদ্রলোক দু'জন বললেন, নাটকের আগামী পর্বে যদি ঘুষ নেবার সিদ্ধান্ত নেই তবে তারাও ঘুষের অফারটা গ্রহণ করবেন। আমি হেসে বল্লাম, নাটকে আমি ঘুষ নেবো না। ভদ্রলোক দু'জন ফিরে গেলেন। জানি না তারা ঘুষের লোভ ছাড়তে পেরেছিলেন কি না। আরেকটি ঘটনা বলি। এক নাটকে হাতের জ্বলন্ত সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে নিভিয়ে স্ত্রী-সন্তানের কাছে প্রতিজ্ঞা করলাম যে, আমি আর কোনোদিন সিগারেটের মতো বাজে নেশা করবো না। পরে বেশ কয়েকজন দর্শককে পেয়েছি, যারা ঐ নাটকের পর বাধ্য হয়েছেন স্ত্রী-সন্তানের কাছে সিগারেট না খাবার ওয়াদা করতে। এবং তারা সত্যি সত্যি সিগারেট ছেড়ে দিয়েছেন। আমি নাটকের ঐ দৃশ্যের বাইরে বাস্তবে অনেক সিগারেট খেতাম। তবে গত এগারো বছর যাবৎ ছুঁয়েও দেখি না। তিরানব্বইয়ের একত্রিশে ডিসেম্বর আমি সিগারেটে শেষ সুখটান দিয়েছি।

আমাদের সময় টেলিভিশনে অভিনয় করে প্রথম স্টার ইমেজ তৈরি করে আসাদ ও বেলাল। পরে সুপার স্টার হয় আফজাল। তার বেশ পরে ফরীদি। আমরা সবাই ঢাকা থিয়েটারের সদস্য ছিলাম। আমরা একসঙ্গে কোনো নাটকে অভিনয় করেছি বলে মনে পড়ে না। তবে প্রথম আমি যে নাটকে দর্শকের নজরে পড়ি সেটি বেলালের লেখা ছিল। প্রযোজক ছিলেন মুস্তাফিজ ভাই। প্রয়াত ডলি ইব্রাহীম (আনোয়ারা), সিডনী ভাই আর আমি ছিলাম মূল চরিত্রের অভিনেতা-অভিনেত্রী। সেই নাটকে আমি স্বকণ্ঠে একটা গান গেয়েছিলাম- 'কত রঙ্গ জানো নিজে নিজে ঘর বানায়া বইসা বইসা ভাঙ্গো।' গানটি খুব হিট করেছিলো। তবে আফজালের লেখা 'ছিনিমিনি' নাটকটিতে বোধহয় আমি অপেক্ষাকৃত ভালো অভিনয় করেছিলাম। আফজালরা তাই বলে। তখন আমরা একসঙ্গে পীরজঙ্গী মাজারের কাছে একটা সরকারি ফ্ল্যাটে সাবলেট থাকি। ফ্ল্যাটটি বরাদ্দ ছিল গায়ক লীনু বিল্লাহ'র নামে। লীনু তখন রেডিওতে চাকরি করতো। আফজালের চাপেই সেই সময় আমি প্রথম টেলিভিশনের জন্যে একটা নাটক লিখি 'কুসুমকাহিনী' নামে। তখন টেলিভিশনে শেষ রোববারে একটি দীর্ঘ নাটক প্রচারিত হতো। সিদ্দিক ভাই আমার 'কুসুমকাহিনী' নাটকের প্রথম প্রযোজক। মনোজ সেনগুপ্ত ছিল তার সহকারী। অভিনয় করেছিলো রিনি রেজা ও আসাদ। আরো ছিলেন মমতাজ উদ্দিন আহমদ, সিরাজুল ইসলাম, ইনামুল হক এবং আরো অনেকেই। তখন রাতভর শুটিংয়ের রেওয়াজ ছিল। এক রাতে একটি দৃশ্যে অভিনয়কালে হঠাৎ রেগে যাওয়া পিতা (মমতাজ উদ্দিন) তার কন্যাকে (রিনি রেজা) সত্যি সত্যি এমন জোরে চড় মারলেন যে রিনির মাথা ঘুরে পড়ে যাবার অবস্থা। রিনির মতো নিবেদিতপ্রাণ অভিনেত্রী ছিল বলেই সেই রাতে শুটিং চালিয়ে নেয়া গিয়েছিলো। মনোজ এখনো প্রায়ই সেই দিনের স্মৃতি আমাকে মনে করিয়ে দেয়।

সত্যি বলতে কি, আমাদের ঐ সময়টা ছিল টেলিভিশন নাটকের জন্যে অত্যন্ত ফলবান। মুক্তিযুদ্ধ-পরবর্তী টিভি নাটকে একটা আলাদা জোয়ার এসেছিলো তখন। নাটকের কাহিনী, স্ক্রিপ্টের মান, অভিনেতা-অভিনেত্রীর আধুনিকমনস্কতা এবং অভিনয় দক্ষতা ইত্যাদি মিলিয়ে টিভি নাটক যেন আলাদা এক অবস্থানে চলে গেলো। গ্রুপ থিয়েটার চর্চার ইতিবাচক প্রভাবে টিভি নাটক যেন সাঁই সাঁই করে সামনে এগুতে লাগলো। টিভি অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সামাজিক মর্যাদা উঠে গেলো অনেক ওপরে। আমার সৌভাগ্য, আমি টেলিভিশনের বেশ কয়েকজন গুণী শিল্পীর বিপরীতে অভিনয় করেছি। যেমন মিতা চৌধুরী, প্রিসিলা পারভীন, রিনি রেজা, সুবর্ণা মুস্তাফা, শায়লা, কেয়া চৌধুরী, আফরোজা বানু প্রমুখ। দিলশাদ খানম রক্তকরবীর 'নন্দিনী' করেছিলো, তার সঙ্গে অভিনয় করার সৌভাগ্য আমার হয়নি। দিলশাদের বড়বোন কবি সুরাইয়া খানমকে চিনতাম বন্ধু আবুল হাসানের যোগ্য প্রেয়সী হিসেবে। তিনি একবার 'শেষের কবিতা'র লাবণ্য হয়েছিলেন। বিপরীতে অমিত হয়েছিলেন সিডনী ভাই। আমি আমার সিনিয়রদের মধ্যে ফেরদৌসী ভাবী, আজমেরী জামান, আলেয়া ফেরদৌসীর বিপরীতে নায়ক হয়েছি। পরে হয়তো ভুলে যাবো তাই আরো কিছ গুণী সহশিল্পীর নাম আগেই বলে নিই। সেখানে আছে শম্পা রেজা, লতা, নূপুর, ফাল্গুনি, নার্গিস, রুবিনা, তারানা, শাম্মী চৌধুরী, ক্যামেলিয়া, শান্তা প্রমুখ। অভিনয় জীবনের শুরুর দিকে চিত্রা নামে এক আধুনিক তরুণীর সঙ্গে অভিনয় করেছিলাম। তাকে আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। সিনিয়রদের মধ্যে আমি লিলি আপার (শর্মিলী) বিপরীতেও অভিনয় করেছি। সাম্প্রতিককালের অভিনেত্রীদের মধ্যে বিপাশার সঙ্গে খুব ভালো একটা নাটকে অভিনয় করেছি। মিমির সঙ্গেও একটি সুন্দর নাটক করেছিলাম। সুইটি, তমালিকা, তারিন, শীলা, টিসার মতো আধুনিক প্রজন্মের নায়িকাদের সঙ্গেও অভিনয় করার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আগের প্রজন্মের কিছু গুণী সহশিল্পীর নাম বাদ পড়ে গিয়েছিলো। সেগুলো উল্লেখ না করা অপরাধ হবে, যেমন ডলি জহুর, লাকী ইনাম, সারা যাকের। সারা যাকেরের সঙ্গে আমি দু'টি ভালো সিরিয়ালে কাজ করেছি। একটি শওকত আলীর উপন্যাস অবলম্বনে 'পূর্বরাত্রি পূর্ব দিন', অপরটি হুমায়ূন আহমেদের 'নীল তোয়ালে'। এই সিরিয়ালটির প্রচার শেষ হবার আগেই একুশে টিভি বন্ধ হয়ে যায়। চিত্রলেখা গুহ আমার সঙ্গে 'বন্ধনে' সহশিল্পী হিসেবে কাজ করেছে। চিত্রলেখার প্রথম টিভি নাটকটিতেও বোধহয় আমি সহশিল্পী ছিলাম। রিনি-শম্পার সর্বকনিষ্ঠ বোন নীপা রেজাও সত্তর দশকে গোটা দুয়েক নাটকে আমার সহশিল্পী ছিল। ইদানীং কিছু সিরিয়ালে আমার বিপরীতে কাজ করছে জয়শ্রী কর।

অভিনয়ের প্রতি নিষ্ঠা ও কঠোর শ্রমদান জয়শ্রীর বড় গুণ। এবার আলাদা করে আমি একজন সহশিল্পীর নাম উল্লেখ করবো যে আর টেলিভিশন নাটকে অভিনয় করে না। তার নাম শিমুল ইউসুফ। শৈশবকাল থেকেই টিভি মিডিয়ার সঙ্গে জড়িত শিমুল গানের পাশাপাশি বেশ কিছু টিভি নাটকে দৃষ্টিকাড়া অভিনয় করেছিলো। একটি নাটকের কথা তো আমার পক্ষে ভোলা অসম্ভব। নাটকটির নাম 'নির্বাসন'। হুমায়ূন আহমেদের গল্প অবলম্বনে নির্মিত নাটকটিতে নজরুলের একটি অসাধারণ গান ব্যবহার করেছিলেন প্রযোজক নাসির উদ্দিন ইউসুফ। গানটি হলো 'তেপান্তরের মাঠে বধূহে একা বসে থাকি, তুমি যে পথ দিয়ে গেছ চলে তারি ধুলো মাখি।' শিমুল আর আমি একসাথে কাজ করেছি সেলিম আলদীনের 'গ্রন্থিকগণ কহে' সিরিয়ালে। এই নাটকে একসঙ্গে অভিনয় করতে গিয়ে কাছ থেকে দেখেছি মঞ্চের শিমুল টিভিতেও অনবদ্য। সুধীজন সমাদৃত এই জনপ্রিয় সিরিয়ালটি আমার বিবেচনায় টিভি মিডিয়ার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। প্রযোজক রিয়াজ উদ্দিন বাদশাকে এই সুযোগে অভিনন্দন জানিয়ে রাখি। বাদশাও আমাদের ঢাকা থিয়েটারের প্রথম দিককার কর্মী। 'সংবাদ কার্টুন' নাটকেও পুলিশের ভূমিকায় অভিনয় করেছিল।

প্রায় বত্রিশ বছর ধরে নাটকে অভিনয় করতে গিয়ে অনেক সহশিল্পীর সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে, গাঢ় বন্ধুত্বও হয়েছে। আমি সজ্ঞানে কোনো বন্ধুর ক্ষতি করিনি। বন্ধুরাও কেউ আমার ক্ষতি করেনি। তবে আমি জানি, আমার ভেতর একটা খারাপ অভ্যাস আছে। যেমন হঠাৎ করেই কোনো বন্ধু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, ওদের আমি আমার মন থেকেও দূরে ঠেলে দিই। 'চোখের আড়াল মানে মনেরও আড়াল'-এই প্রচলিত কথাটি আমি বিশ্বাস করি না। তবে অদেখার সময়টি যতই দীর্ঘায়িত হয় ততই এক ধরনের সংকোচ এসে আমার পায়ে জড়ায়। আমি ফেলে আসা বন্ধুর কাছে ফিরে যেতে ক্রমশ আড়ষ্ট হই। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। যেমন কেয়া চৌধুরী আমার খুবই কাছের বন্ধু। আমার চেয়ে মাত্র পনের দিনের ছোট এই গুণী শিল্পীর (মানুষও!) প্রথম

'গ্রন্থিকগণ কহে' নাটকে জহিরউদ্দিন পিয়ার ও আমি

সন্তান জয়িতার কথা বেশ মনে আছে। দ্বিতীয়টিকে আজো দেখিনি। জয়িতা এখন স্কুলের প্রায় শেষ ধাপে বোধহয়। তার মানে হিসেব করে দেখলাম, কেয়াদের সাথে আমার প্রায় বছর তেরো দেখা হয় না। অথচ একই শহরে থাকি। এক আকাশের নিচে। একই কোলাহলময় সন্ত্রাসতাড়িত নগরে।

সুঅভিনেত্রী প্রিসিলা। প্রিসিলা পারভীন। ওর স্বামী আখতার ভাই। কন্যা রাশনা ও পুত্র অমিত সবই আমার আপনজন। প্রিসিলা আমাদের ঢাকা থিয়েটারের প্রথম দিককার সদস্য ছিল। ওর বড় বোনের স্বামী জাহাঙ্গীর ভাই ঢাকা থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (বর্তমানে রাষ্ট্রদূত)। নব্বই দশকের প্রথম দিকটায় আমার জীবনের চরম দুর্যোগ-দুঃসময় মাখা দিনগুলোতে প্রিসিলারা আমার জন্যে যা করেছে তার ঋণ জীবনেও শোধ দিতে পারবো না। অথচ কতোদিন ওদের সঙ্গে যোগাযোগ নেই। এ এক অদ্ভুত কুণ্ঠা আমাকে মাঝেমাঝে ভীষণ অস্থির করে তোলে। সবার জন্যে, সবার তরে আজ আমার করজোড় স্বীকারোক্তি হোক রবিঠাকুরের ভাষায়- 'যে কেহ মোরে দিয়েছ সুখ দিয়েছ তারি পরিচয় সবারে আমি নমি।'

ছয়

গোলাম মুস্তাফা, হাসান ইমাম, সৈয়দ আহসান আলী সিডনী, আবদুল্লাহ আল-মামুন, বুলবুল আহমেদ, সিরাজুল মজিদ মামুন, আলতাফ হোসেন, ফিরোজ ইফতিখার, সৈয়দ সিদ্দিক হোসেন- এরা আমাদের আগের প্রজন্ম। এদেরই পথ ধরে পরবর্তীকালে আমরা টিভি নাটকে অভিনয় শুরু করি। আমাদের মধ্যে বেলাল (আল মনসুর) তার সহজিয়া অভিনয় দিয়ে টিভি নাটকের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যোগ করলো, যা ভীষণ জনপ্রিয়ও হয়ে উঠলো। নাটকের কিছু কিছু মুহূর্তে এই প্রজন্মের নায়কদের অভিনয় দেখে মনে হয় বেলালের সেই অভিনয় প্রভাব থেকে তারাও বেরোতে পারে না। আর একজনের নাম নেবো। সে হলো মিতা চৌধুরী। সারল্যমাখা একখানা মুখ, উজ্জ্বল চোখের মিতারও ছিল সহজিয়া ভঙ্গিতে অত্যন্ত স্বাভাবিক ঢঙের অভিনয় ক্ষমতা। মিতা বিদেশে চলে গেছে দীর্ঘদিন। মিতার পর সুবর্ণা দীর্ঘদিন ধরেই টিভি নাটকের উচ্চাসনটি ধরে রেখেছে। কম দিন নয়। সুবর্ণা টিভিতে কাজ করছে আমার জানামতে বছর তিরিশেক ধরে। সম্ভবত ও যখন ক্লাস এইটের ছাত্রী তখন থেকে। ঢাকা থিয়েটারের সংসারে সুবর্ণা ঐ বয়সেই দলভারী করেছিল। সুবর্ণার প্রথম টিভি নাটক কোনটা ছিল! জহির রায়হানের 'বরফগলা নদী' নাকি 'হাজার বছর ধরে'। এসব কথা এতদিন পরে মনে করতে পারি কারণ তখন আমরা একে অন্যের কাজে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করতাম। আসাদ কোনো নাটকের রেকর্ডিং করছে আর আমি সেখানে গিয়ে স্ক্রিপ্ট পড়তে তাকে সাহায্য করবো না কিংবা কস্টিউম গুছিয়ে দেবো না, তা কি হয়!

আবার আফজালের রেকর্ডিং-এ আমরা দলবেঁধে ছুটে যেতাম টিভি স্টুডিওতে।

আমাদের সময়কার আর এক উজ্জ্বল যুবক ছিল যার নাম হাবিবুল হাসান। নাটক রচনা কিংবা অভিনয়ে ওর একটা নিজস্বতা ছিল। ভীষণ তেজী ও মৌলিক ছিল হাবিবের ভাবনা-চিন্তা। 'সম্রাট ও প্রতিদ্বন্দ্বীগণ' নাটক লিখে মঞ্চে আলোড়ন তুলেছিল হাবিবুল হাসান ঐ বয়সেই। সকাল-সন্ধ্যার মাকনাভাইকে কি কেউ ভুলে গেছে! মনে হয় না। দস্তয়ভস্কির 'ইডিয়ট' অভিনয় করে গানের শিল্পী শম্পা রেজা ভীষণভাবে চমক দিয়েছিলো। শম্পার দিকে তাকালে এখনো আমার 'ইডিয়টে'র কিছু কিছু দৃশ্য চোখে ভাসে। আবদুল্লাহ আল মামুন ছিলেন সেই নাটকটির প্রযোজক। ইডিয়ট স্ক্রিপ্ট করেছিলো বেলাল। বুলবুল ভাই এবং আসাদ ছিল বাকি দুটি মুখ্য চরিত্রে। দস্তয়ভস্কির 'ইডিয়ট' উপন্যাস অবলম্বনে এর আগেই অবশ্য একটি চলচ্চিত্র তৈরি হয়েছিল। প্রখ্যাত সাহিত্যিক সমরেশ বসু সেই চলচ্চিত্রের চিত্ররূপ ও সংলাপ লিখেছিলেন। উত্তম কুমার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এবং অর্পণা সেন ছিলেন সেই চলচ্চিত্রের মূল পারফরমার। চলচ্চিত্রটির নাম 'অপরিচিত'। অ্যান্টিহিরো চরিত্রে উত্তমের সে কি ফাটাফাটি অভিনয়! বিটিভির নাটকে চরিত্রটি করেছিলো আসাদ।

আমার প্রথম টিভি নাটকে আমিও অ্যান্টিহিরো চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম। নাটকটির নাম 'বিশ্বাসঘাতকের মা'। বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে নাটকটি লিখেছিলেন জিয়া আনসারী এবং প্রযোজনা করেছিলেন হায়দার রিজভী। চলচ্চিত্রের ওপর উচ্চশিক্ষা নিতে যিনি পোল্যান্ডে গিয়ে ওখানেই থেকে গেছেন। নাটকের গল্পটি আমাকে এখনো বেশ টানে। একটি ঝকঝকে তরুণ সামরিক বাহিনীতে নির্বাচিত হয়েছে। বিধবা মা ছাড়া তার আপন কেউ নেই। তরুণটি আর্মি ট্রেনিংয়ে চলে যাবার পরপরই দেশে শুরু হলো অসহযোগ আন্দোলন। তারপর ১ মার্চ ইয়াহিয়া খানের অনিয়মতান্ত্রিক ঘোষণা, ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ এবং ২৫ মার্চ পাক আর্মির ক্র্যাকেডাউন। জ্বলে উঠলো দেশ। বিধবা মা অপেক্ষায় থাকেন। প্রত্যাশা তার পাড়ার অন্যান্য তরুণের মতো তার ছেলেটিও যেন যুদ্ধে যায়। একদিন ছেলে তার ট্রেনিং শেষে ঘরে ফিরে আসে। ঝকঝকে, টগবটে আর্মি লেফটেন্যান্ট ছেলেটির মধ্যে মা দেখেন অন্য চেহারা। পাড়ার আর সব মুক্তিযোদ্ধা ছেলেদের সাথে যার কোনো মিল নেই। সদা উৎফুল্ল ছেলেটি দেশের ভয়াবহ অবস্থা নিয়ে মোটেই চিন্তিত নয়। বরং আর্মি অফিসার ছেলেটি দেশের অবস্থাকে 'গন্ডগোল' হিসেবে উল্লেখ করে অহঙ্কারী ভঙ্গিতে বললো, 'এই গণ্ডগোল আমরা দু'দিনেই ঠিক করে ফেলবো।' মা বুঝে ফেলেন ছেলে তার ভুল পথে, শত্রুর পক্ষে চলে গেছে। কষ্ট পেলেন বিধবা মা। রাতে ছেলেকে পাশে বসিয়ে অনেক গল্প করলেন, পছন্দের নানা পদের তরকারি রান্না করে ভাত খাওয়ালেন, আদর করে ঘুম পাড়ালেন। তারপর ভোর ভোর সময় ছেলের বালিশের নিচে রাখা রিভলবার দিয়ে নিজ হাতে ছেলেকে গুলি করে মেরে ফেললেন। মায়ের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সুমিতা দেবী আর তরুণ আর্মি অফিসারটি আমি। এই নাটকে আসাদও অভিনয় করেছিল। সম্ভবত এটি আসাদেরও প্রথম টিভি নাটক। ক্যামেরার মাথায় লাল বাতি জ্বললে সংলাপ বলতে হয়- সেই যে শিখেছিলাম, এতো বছর ধরে আজো চালিয়ে যাচ্ছি। নায়ক-ভিলেন-বুড়ো-গুন্ডা-পাগল-মাঝি-মুক্তিযোদ্ধা-ব্যর্থপ্রেমিক-ভণ্ডস্বামী-বেকারযুবক-ট্রাক ড্রাইভার ইত্যাদি কত যে চরিত্র। একবার ট্রাক ড্রাইভার চরিত্রে অভিনয় করলাম। লোকটা খুব বদরাগী এবং নিষ্ঠুর প্রকৃতির। রাস্তায় মানুষ চাপা দিয়েও লোকটার হৃদয় নরম হয় না। এই রকমই নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিল চরিত্রটি। নাটকটি প্রচারিত হবার পর ভাবতাম, সত্যিকারের ট্রাক ড্রাইভাররা নিশ্চয়ই আমার ওপর নাখোশ হবেন। কিন্তু না, হলো তার উল্টো। একরাতে নয়ারহাট ব্রিজের কাছে দাঁড়িয়ে আছি বাসের জন্য। প্রায় বারোটা পেরিয়ে যাওয়া রাত। কোনো বাসই থামছে না। হঠাৎ একটা ট্রাক আমাকে ক্রস করে সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে গেলো। হেলপার ছোকড়াটি এসে বললো 'উস্তাদে ডাকে আপনেরে।' ভাবলাম এই রে ট্রাক ড্রাইভারের চরিত্র খারাপ দেখিয়েছি বলে এইবার বুঝি আমাকে একহাত নেবে ওরা। দুরু দুরু বক্ষে এগিয়ে গেলাম অন্ধকারে।

'কই যাইবেন?'

'ঢাকায়।'

'এ্যাত রাইতে কি করতাছিলেন এই হানে?'

'শুটিং-এ এসেছিলাম।'

'উডেন। আপনি তো হেইদিন কামাল কইরা ফালাইছেন।'

বুঝলাম ট্রাক ড্রাইভার নাটকটি দেখছেন। ভয়ে ভয়ে উস্তাদের সিটের পাশে উঠে বসলাম। আমার ঢাকায় ফিরতেই হবে। কলা বোঝাই ট্রাকটি আসছিল শৈলকোপা থেকে।

'আপনার অ্যাকটিং হেইদিন জব্বর লাগছে। এক্কেবারে অরজিনিয়াল।'

আমি বুঝতে পারলাম না, ট্রাক ড্রাইভারটি নাটকের খারাপ চত্রিটিকে কেন পছন্দ করলেন। চরিত্রটি তার গোত্রের এবং পেশার বলে? কে জানে! ট্রাক ড্রাইভারটি সেদিন কথা বলেছিলেন-

'বুঝলেন মিয়াভাই- নায়কের অ্যাকটিং-এর চায়া ভিলেনের অ্যাকটিং করা কঠিন। হক্কলে করবার পারে না। ভিলেন হইতে ফ্যাটাইন্যা পিলিয়ার লাগে।'

সেদিন জেনেছিলাম নায়ক দিলীপ কুমারের পাশাপাশি খলনায়ক প্রাণকেও ড্রাইভারটি সমান পছন্দ করেন। সেদিন আবারো নতুন করে পুরনো কথাটি শিখলাম- ভালো অ্যাকটিং সব সময় দর্শকের মন কাড়ে।

ভালো অভিনয় করতে পারি কি না জানি না, তবে ভালো অভিনয় করবার চেষ্টা যে সব সময় করি সে কথা আমি অকপটে স্বীকার করছি। হয়তো সেটা আমার অভিনীত নাটক দেখলে বোঝাও যায়। নইলে দর্শকের কাছ থেকে চলতে-ফিরতে ফিডব্যাক পাই কেন! আমাদের সময়কার কেউ কেউ আছেন যারা 'ভালো মানুষ'-এর চরিত্র ছাড়া অভিনয় করেন না। সমাজে 'ভালো মানুষী' ভাবমূর্তি যদি নষ্ট হয়ে যায়, এই ভয়ে। ইলেকশান-ফিলেকশান, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে হয়তো তাদের এই ভাবনা-চিন্তা কাজে লাগলেও লাগতে পারে। কী অদ্ভুত! আমার কিন্তু এই ধরনের হিসাব-নিকাশ নেই। অভিনয়ের একজন শিক্ষানবীশ হিসেবে আমি 'প্রোটাগনিস্ট' এবং 'অ্যান্টাগনিস্ট' দুই ধরনের চরিত্রেই অভিনয় করি। শুধু চরিত্রটির গুরুত্ব আছে কি না, চরিত্রটিতে ভালো কাজ এবং নতুন কাজ করবার সুযোগ আছে কি না, সেটাই আমার বিবেচনার বিষয়। এ ব্যাপারে আমি প্রথম থেকেই পরিষ্কার। নইলে 'সকাল-সন্ধ্যা' সিরিয়ালের ভালোমানুষ, 'শাহেদ' হয়ে কোন্ সাহসে 'কিত্তনখোলা' নাটকের মন্দ মানুষ 'ইদুল হক' চরিত্রে অভিনয় করি। আমি ভাগ্যবান। 'শাহেদ' এবং 'ইদুল হক' দুই চরিত্রেই আমি নমস্য দর্শককুলের কাছ থেকে প্রচুর অ্যাপ্রিসিয়েশন পেয়েছি। আজকাল অনেককে চরিত্র সম্পর্কে বলতে শুনি 'নেগেটিভ' এবং 'পজেটিভ'। আমার জ্ঞানে এই ধরনের কোনো বিশেষণ জানা আছে বলে জানি না। আমি বিশ্বাস করি, তথাকথিত 'নেগেটিভ' অথবা 'পজেটিভ' যে চরিত্রেই অভিনয় করি না কেন, অভিনীত চরিত্রটি যদি দর্শক মনে বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারে, যদি কোন্টা ভালো আর কোন্টা মন্দ তা স্পষ্ট করে দিতে পারে, তবেই আমি সার্থক। একজন সচেতন অভিনেতা হিসেবে শিল্পের প্রয়োজন ছাড়াও আমার সামাজিক দায়টুকুও এ ক্ষেত্রে পালিত হয়ে যায়। একজন অভিনেতা যদি সামাজিক না হয় তবে তো সে মূর্খ। বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে শুধু ভাববাদী এবং ভোগবাদী হয়ে তাসের ঘরে বসে থাকতে চায় তারা না বুঝে মূর্খের স্বর্গেই বাস করে।

ফিরে আসি আগের কথায়। আমি মনে করি 'পজিটিভ' এবং নেগেটিভ' যাই হোক না কেন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয়ের চ্যালেঞ্জ না গ্রহণ করাটা বোকামি। এ ব্যাপারে খোকন ভাই (এটিএম শামসুজ্জামান) আমাকে সব সময় জোরালো সমর্থন দিয়ে আসছেন। তবে একশ্রেণীর ভক্তদর্শক থাকেন, যারা তার পছন্দের অভিনেতাকে একটি বিশেষ ধরনের চরিত্রেই দেখতে চান। অনেক অভিনেতা এই বিষয়টিকে অধিকতর গুরুত্ব দেন। আমি এই দলে কোনোদিনই থাকতে চাইনি। আচ্ছা বুলবুল ভাইকে কি কোনদিন মন্দলোকের চরিত্রে অভিনয় করতে দেখেছি! রোমান্টিক নায়ক হিসেবে উত্তম কুমার যখন মধ্যগগনে তখন তিনি 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'-এ রাইচরণের মতো গ্ল্যামারহীন চরিত্রে অভিনয় করেছেন। 'অপরিচিত' এবং 'স্ত্রী' ছবিতে সেজেছিলেন অ্যান্টিহিরো।

সাত

অনেক কথা হলো, অনেক কথা তবু বাকি। বাকি কথা থেকেই দু'এক মুঠো তুলে এনে এ

লেখার সমাপ্তি টানি বরং। প্রথমেই বলি ‘সকাল-সন্ধ্যা’র কথা। বিটিভি’র প্রথম দর্শকপ্রিয় সিরিয়ালটির নাম ‘সকাল-সন্ধ্যা’। আশি দশকের গোড়ার দিকে প্রায় আড়াই বছর স্থায়ী এই দর্শকপ্রিয় সিরিয়ালের পর্ব সংখ্যা মাত্র বাষট্টি। এখনকার নতুন দর্শকরা শুনে হয়তো বিস্মিত হচ্ছেন। তখন পনের দিন পরপর পর্ব-প্রচারিত হতো। পর্বের স্থায়িত্ব ছিল পুরো এক ঘন্টা। এখনকার মতো কুড়ি-বাইশ মিনিটের পর্ব তো তখন ছিল না। ‘সকাল-সন্ধ্যা’ প্রচারিত হতো মাসের দুই মঙ্গলবারে। ঐ দুই মঙ্গলবার রাত আটটার পর শহরের বেশিরভাগ মানুষ (যাদের বাড়িতে টিভি সেট ছিল) নিজ নিজ ঘরে ফিরে যেতেন। রেলস্টেশন, ক্লাব, পার্ক ইত্যাদি অঞ্চলের তখন সরকার- প্রদত্ত টিভি সেট ছিল। সেখানে যে রকম ভিড় হতো ‘সকাল-সন্ধ্যা’ দেখার জন্য, তা আজ লিখে বোঝানো যাবে না। ‘সকাল-সন্ধ্যা’ প্রচারিত হবার প্রথম দিকে আমার নিজস্ব টিভি সেট ছিল না। আমি আবাসিক হলের কমনরুমে কিংবা কমলাপুর স্টেশন অথবা রমনা পার্কের ভিতর গিয়ে শত জনের পেছনে দাঁড়িয়ে ‘সকাল-সন্ধ্যা’ দেখতাম। অথচ আমি ছিলাম ঐ সিরিয়ালের অন্যতম একটি প্রধান চরিত্র। অনেক দর্শকের সাথে ভালোলাগা, মন্দলাগা শেয়ার করতে ভালই লাগতো। একবার কমলাপুর স্টেশনে দর্শকের পেছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে নাটক দেখছি। কী করে যেন আমার সামনে দাঁড়ানো একজন দর্শক আমাকে দেখে ফেললেন। তারপর কানাকানি ফিসফাস হতে হতে সবাই জেনে গেলেন আমার উপস্থিতির কথা। সবাই তখন পেছনের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখতে শুরু করলেন। ঐ দিকে সামনে টিভি স্ক্রিনে যে নাটক চলছে সেই দিকে কারো চোখ নেই। ভীষণ বিব্রত হয়েছিলাম সেদিন। মজাও পেয়েছিলাম।

‘সকাল-সন্ধ্যা’র আগে টিভিতে যে সিরিয়াল হতো না, তা নয়। তবে সিরিয়ালগুলো মূলধারার নিয়মিত নাটকের মতো সমাদর ও স্বীকৃতি কিছুই পেতো না। বেশিরভাগই ছিল প্রোপাগান্ডামূলক। যেমন জনসংখ্যা, কৃষি, স্বাস্থ্য সচেতনতা বিষয়ক নাটক। আসকার ইবনে শাইখের লেখা ‘রাজ্য রাজা রাজধানী’ নামে ইতিহাস নির্ভর একটা সিরিয়াল প্রচারিত হতো, যেখানে ইলিয়াস কাঞ্চন অন্যতম প্রধান চরিত্রে অভিনয় করতেন। মুক্তিযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে অবশ্য কয়েকটি সিরিয়াল তৎকালীন পিটিভি প্রচার করতো। যেমন ‘দম্পতি’, ‘ত্রিরত্ন’। খান জয়নুল, আশীষ কুমার লোহ এবং জলিল অভিনীত ‘ত্রিরত্ন’ কমেডি সিরিয়াল হিসেবে ভীষণ জনপ্রিয় ছিল। তখন ক’জনার বাড়িতেই বা টিভি সেট ছিল। আর এখন, ঘরে ঘরে টিভি সেট অথচ ‘ত্রিরত্নে’র মতো উচ্চমানের কমেডি সিরিয়াল নেই। ‘সকাল-সন্ধ্যা’র মতো ফ্যামিলি সোপই বা এখন কোথায় পাই!

ঐ সময়ে সারা পৃথিবীতে টিভি দর্শকের মাতিয়ে রেখেছে ‘ডালাস’ নামের একটা অসাধারণ ফ্যামিলি সোপ। ‘সকাল-সন্ধ্যা’র উপর যে ‘ডালাসে’র প্রভাব ছিল না তাই বা বলি কি করে! মমতাজ আপা (সকাল-সন্ধ্যার নাট্যকার বেগম মমতাজ হোসেন) তখন উদয়ন স্কুলের প্রধান শিক্ষক। চলচ্চিত্র পরিচালক আলমগীর কবীরের সহোদরা হিসেবেও মমতাজ আপনাকে চিনতাম আগে থেকেই। শিশু-কিশোরদের উপযোগী আগে একটা সিরিয়াল লিখেছিলেন মমতাজ আপা। বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল সেই সিলিয়ালটি। তো একদিন বিটিভির একটি সাপ্তাহিক নাটকের রিহার্সেল করছি। জিয়া ভাই (প্রযোজক জিয়া আনসারী) তার কক্ষে ডেকে পাঠালেন। গেলাম। বললেন, বিটিভি একটি ধারাবাহিক নাটক প্রচার করতে চাইছে এবং সেই নাটকে আমাকে প্রধান পুরুষ চরিত্রে অভিনয় করতে হবে। ধারাবাহিক প্রযোজনা করবেন মোঃ বরকতউল্লাহ। বরকতউল্লাহ সাহেবের কোনো প্রোগ্রামে আমি আগে কখনো অংশ নিইনি। তিনি মূলত নাচের প্রোগ্রাম করতেন। আমি নাচের কেউ নই, তাই নাচের প্রোগ্রামে অংশ নেবার কথাই আসে না। মোঃ বরকতউল্লাহ নিজে নৃত্যশিল্পী হিসেবে খুবই গুণী ছিলেন। তাঁর সহধর্মিণী (সহশিল্পীও) জীনাত বরকতউল্লাহ তখন জনপ্রিয়তার তুঙ্গে। আমি যখন নাটকে অভিনয় করবার জন্য ডিআইটি (বর্তমানে রাজউক) ভবনের টিভি স্টেশনে প্রথম যাতায়াত শুরু করি তখন মোঃ বরকতউল্লাহ ইংল্যান্ডে, উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য অবস্থান করছেন। শফিক ভাই, জিয়া ভাইদের কাছে তাদের সহকর্মী বরকতউল্লাহর নাম শুনে মনে মনে তার একটা চেহারা আঁকার চেষ্টা করতাম। থুতনিতে ‘ছাগইল্যা দাড়ি’ মাথায় টুপি, খাটো পাজামা, লম্বা চুলের পাঞ্জাবি- এই রকম আর কি! বরকতউল্লাহ সাহেব যেদিন ইংল্যান্ড থেকে ফিরে প্রথম অফিসে এলেন সেদিন তাকে দেখে আমার তো চক্ষু চড়কগাছ। কী ছিমছাম! কী ঝরঝরে-তকতকে! কী উজ্জ্বল পুরুষ! হাতে একখানা বিলেতি ছাতা, গায়ে বিলেতি জ্যাকেট। সুবেশী, হাস্যমুখ একখানা পুরুষটির দিকে তাকিয়ে মনে হলো- হায় হায় এই লোকটির কী ভুল চেহারাই না আমি মনে মনে এঁকেছি। এটা সত্তুর দশকের প্রথম দিককার কথা। বিটিভির অফিস-স্টুডিও তখন ছিল ডিআইটি (বর্তমান রাজউক) ভবনে।

ফিরে আসি রামপুরা টিভি ভবনের প্রযোজক জিয়া আনসারীর কক্ষে। জিয়া ভাই বললেন, উচ্চতর কর্তৃপক্ষ ‘ডালাসে’র মত একটি পারিবারিক সিরিজ প্রচার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সিরিজটির অনেকাংশই লেখা হয়ে গেছে। লিখেছেন বেগম মমতাজ হোসেন। তবে তিনি তাকে সহযোগিতা করেছেন এই ব্যাপারে। আমি জিয়া ভাইয়ের প্রস্তাবে ‘না’ করলাম। এই না করার পেছনে অনেকগুলো কারণ ছিল। যার কিছু এখন উল্লেখ করা যেতে পারে। এক. ধারাবাহিক নাটকে অভিনয় করলে মূলধারার নাট্যভিনেতা হিসেবে ভাবমূর্তি হারাবো। দুই. ধারাবাহিকে অভিনয় করলে প্রচলিত নিয়মে নিয়মিত সাপ্তাহিক নাটকে অংশ নিতে পারবো না। তিন. টাইপ্ড হয়ে যাবার আশঙ্কা। এই সব বিষয়গুলো বিবেচনায় এনে আমি আমার অবস্থান জিয়া ভাইকে স্পষ্ট জানিয়ে দিলাম। আরো একটি বিষয় আমার কাছে সেদিন গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। সেটি হলো, ধারাবাহিক সোপ নাটকে কাহিনী এবং চরিত্রের শেষটা সাধারণত আগে সম্পূর্ণ লেখা থাকে না বলে চরিত্রের পরিণতি বোঝা যায় না। একজন অভিনেতা হিসেবে এটাও আমার অসম্মতির অন্যতম কারণ ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে আমার সকল দুর্ভাবনা দূর করার আশ্বাস পেয়ে ধারাবাহিক কাজ করবার জন্য মন ঠিক করলাম। এক রোববারের সকালে সাপ্তাহিক ছুটির দিনে স্ক্রিপ্ট নিয়ে আলোচনা করতে চলে গেলাম বরকত ভাইয়ের বেলী ডাম্পের ছোট্ট ফ্ল্যাটে। কাজু আর বিজু অর্থাৎ কাজরী আর বিজরী তখন এইটুকুন! কাজু একটু চুপচাপ আর শান্ত, বিজু ছিল ভারী ছটফটে আর প্রগলভ। বরকত ভাই আর জীনাত ভাবীর দুটি মেয়েই খুব মিষ্টি, আর আদরকাড়া চেহারা ছিল ওদের। এখানকার বিজরীকে দেখলে সেই ছোট্ট বিজুর কথা মনে পড়ে। বিজরীরও একটি নাদুস-নুদুস মিষ্টি সন্তান এখন। বরকত ভাই প্রথমেই বললেন, স্ক্রিপ্ট শেষ হয়নি। যেহেতু ধারাবাহিকটি কত পর্বের হবে তা নির্ধারিত হয়নি, তাই স্ক্রিপ্ট শেষ করাও সম্ভব হচ্ছে না। তবে পরবর্তী পর্ব লেখার আগে বরকত ভাই আমার মতামতকেও গুরুত্ব দেবেন বললেন। যা অবশ্য শেষ পর্যন্ত হয়নি। যে কারণে শেষের দিকে আমি আর সিরিজটিতে অভিনয় করিনি। বরকত ভাইয়ের ফ্ল্যাটে স্ক্রিপ্ট নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জানালাম, মমতাজ আপা ধারাবাহিকটির নাম দিয়েছেন ‘শামীমার সংসার’। আমি নামের ব্যাপারে আপত্তি করলাম। বরকত ভাই বললেন, তিনি নিজেও নামটি পরিবর্তন করতে চাচ্ছেন এবং কবি জীবনানন্দ দাশের কবিতা থেকে একটি নামও মনে মনে বেছে রেখেছেন। প্রযোজক হিসেবে তিনি সিরিজটির নাম রাখতে চান ‘সকাল-সন্ধ্যা’। নাম পরিবর্তন এবং চূড়ান্তকরণের ব্যাপারে বরকত ভাইকে দেখেছি সিদ্ধান্তে অনড় থাকতে। স্বল্পভাষী, নিম্নস্বরে কথা বলা সুদর্শন লোকটির ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা হয়ে গেল অল্প সময়েই। জানলাম, মোঃ বরকতউল্লাহ নামের ঝকঝকে ভদ্রলোকটির জন্মস্থান দক্ষিণে। নদীমাতৃক পটুয়াখালী অঞ্চলে একরোখা জনপদে তাঁর প্রপিতামহের আদি বাড়ি।

‘সকাল-সন্ধ্যা’ নাটকে আমার চরিত্রটির নাম ছিল শাহেদ। আমার স্ত্রী চরিত্রের নাম ছিল শামীমা ওরফে শিমু। এই চরিত্রে অনেককে বিবেচনায় এনে, অনেক ভাবনা-চিন্তা করে শেষ পর্যন্ত বেছে নেয়া হলো আফরোজা বানুকে। আফরোজা তখন রেডিওর অ্যানাউন্সার হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। টেলিভিশনেও ‘কুমুর নিজের জীবন’ এবং ‘সেতু কাহিনী’ করে বেশ দর্শক-সমাদৃতও হয়েছে। তাছাড়া থিয়েটার গোষ্ঠীর নিয়মিত মঞ্চকর্মী হিসেবে ‘পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়’ নাটকে অভিনয় করতে দক্ষিণ কোরিয়াও ঘুরে এসেছে। নাটকে আমাদের একটি সন্তান ছিল। ছোট্ট, মিষ্টি এবং ভীষণ আদুরে। চরিত্রটির নাম বুবলি। ওর

আসল নাম ছিল তাসনুভা। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে ওর জনপ্রিয়তা এমন জায়গায় পৌঁছে গেলো যে সবার কাছেও বুবলি নামেই পরিচিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলো। অনেক দর্শকের কাছে আমি হয়ে গেলাম তখন বুবলির বাবা। বুবলির আসল বাবা, আমাদের প্রিয় খোকা ভাই কি আমাকে খানিক ঈর্ষা করতেন? সম্ভবত তা নয়। আর ঈর্ষা করলেও তা অযৌক্তিক বা অবান্তর হতো না। কারণ বুবলি তো নিজেই, কেউ তার বাবার নাম জিজ্ঞাসা করলে আমার নাম বলে দিতো। আদরের বুবলী অর্থাৎ তাসনুভা এখন বিবিএ পাস করে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিজীবী। মুখটা সেই আগের মতোই মিষ্টি ও মায়ামাখা। ভীষণ লক্ষ্মী চেহারা। 'সকাল-সন্ধ্যা' নাটকে অনেকগুলো শিশু-কিশোর চরিত্র ছিল। ফ্যামিলি ড্রামা হিসেবে নাটকটি জনপ্রিয় করে তুলতে ওদের ভূমিকাকে আমি খুব বড় করে দেখি। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে পড়ছে সাজিয়া, শিপলু, মোনালিসার কথা। নাটকে এরা ছিল সম্পর্কে আমার শালা-শালী।

পঞ্চাশতম জন্মদিনে নাসিরউদ্দিন ইউসুফ ও কবি আসাদ চৌধুরী সঙ্গে

বিশেষ করে সাজিয়াকে যখন আমি নাটকে আদর করে 'ফাওগিন্নি' বলে সম্বোধন করতাম তখন এটা দর্শকরা খুব পছন্দ করতেন। এখনো যখন কোনো ভদ্রলোক দেখি তার শ্যালিকাকে 'ফাওগিন্নি' বলে সম্বোধন করছেন, তখন বুঝি এটা তিনি 'সকাল-সন্ধ্যা' থেকে শিখেছেন। 'সকাল-সন্ধ্যা' নাটকে আরো অনেক উল্লেখযোগ্য শিশু শিল্পী ছিল। যেমন রাব্বী ভাইয়ের মেয়ে মিশু (আমাদের মামণি), অপি করিম, সরোয়ার ভাইয়ের ছেলে রঞ্জু, ইলোরা গহর, মালাসহ আরো অনেকে।

বুবলি প্রসঙ্গে একটা ঘটনার কথা মনে এসেছে। বলে ফেলি। একবার এক পর্বে আমি অর্থাৎ শাহেদ তার স্ত্রীর সঙ্গে বেশ রূঢ় আচরণ করলো। স্ত্রী অর্থাৎ শিমু কাঁদাকাটি করে তার পিত্রালয়ে চলে গেলো ক'দিনের জন্যে। পরের পর্বের শুটিং করার সময় হঠাৎ লক্ষ্য করলাম বুবলি আমার সঙ্গে কথা বলছে না। শুটিং চলাকালে দৃশ্যের ভেতর আদর করে কোলে নিতে গেলাম, ঝটকা মেরে আমার হাত সরিয়ে দিলো। আমার দিকে তাকায় না পর্যন্ত, গম্ভীর মুখ করে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে। আরে ব্যাপারটা কি! বুবলির কাছ থেকে এই রকম অস্বাভাবিক আচরণে দুশ্চিন্তায় পড়লাম। পরে জানা গেলো আগের পর্বেও ওর মা অর্থাৎ শিমুর সঙ্গে কেন আমি রূঢ় আচরণ করেছি, কেন তার মাকে বকাঝকা করছি, কেন তার মা কেঁদেছে- এই হচ্ছে আমার অপরাধ। পরে ওর সামনে শিমুর কাছে ক্ষমা চেয়ে আমি বুবলিকে স্বাভাবিক করলাম।

'সকাল-সন্ধ্যা' সিরিজ নিয়ে কত যে কথা, কত যে স্মৃতি। ভাবতে আনন্দও লাগে, কষ্টও লাগে। চেইন স্মোকার জহরদা পৃথিবীতে নেই। 'রংবাজ' খ্যাত পরিচালক অজাতশত্রু জহিরুল হকের মতো ভালোমানুষ সিনেমা-টিভির জগতে ক'জন আছে! শাহেদের মা চরিত্রে অসাধারণ অভিনয় করে দর্শক মাতানো শিল্পী রওশন জামিলও নেই। মতিন ভাই, মিতা ব্যানার্জী ইহধাম ছেড়ে চলে গেছে- ভাবতেও কষ্ট হয়। বিশেষ করে অকালপ্রয়াত মিতা ব্যানার্জী যে কিনা 'ফাতু' চরিত্রে অভিনয় করে প্রচুর খ্যাতি পেয়েছিলেন, তার কথা মনে পড়লে খুবই কষ্ট হয়। আর যারা পৃথিবীতে থেকেও ঈর্ষণীয় প্রতিভা নিয়ে অভিনয় জগৎ থেকে দূরে সরে গেছে তাদের জন্যেও মন খারাপ হয় বৈকি। যেমন সাজিয়া, শিপলু, মোনালিসা, রীনা সুলতানা ওদের মধ্যে থেকে শুধু অপি আর ইলোরা এখনো দক্ষতার সঙ্গে নিয়মিত অভিনয় করে যাচ্ছে।

'সকাল-সন্ধ্যা'র অভাবনীয় দর্শকপ্রিয়তার কারণে বিটিভিতে পরে আরো অনেকগুলো সুলিখিত ও সুপ্রযোজিত ফ্যামিলি সোপ প্রচারিত হয়েছে। শিল্পী-নাট্যকার-কুশলীরা প্রচুর জনপ্রিয়তাও পেয়েছেন। কিন্তু কোনোটাই বোধহয় 'সকাল-সন্ধ্যা'কে ছাড়িয়ে যায়নি। আগেই বলেছি 'সকাল-সন্ধ্যা'র কোন দৃশ্যের ভিউকার্ড, পোস্টার যেভাবে বিক্রি হতো তা এ দেশের এখনো পর্যন্ত বিরল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার হলো 'সকাল-সন্ধ্যা' নামের বাস, হোটেল, রেস্তোরাঁ, আগরবাতি, কসমেটিকস্, বিস্কুট, চানাচুর, ডিপার্টমেন্ট স্টোর কোনোটাই কিন্তু সেই রকমভাবে বাণিজ্যিক বাজার পায়নি। প্রায় ফ্লপ মারতে বসা 'সকাল-সন্ধ্যা' নামের এক রেস্তোরাঁর মালিককে পরামর্শ দিলাম, নাম সামান্য পাল্টে 'সকাল ও সন্ধ্যা' করে ফেলেন। আমার কথামতো তিনি নাম পাল্টালেন এবং রেস্তোরাঁটি অল্প দিনেই বেশ রমরমা হয়ে উঠলো। ফুটবল গ্যালারির 'কুফা' কাটানোর ব্যাপার আর কি। আবাহনী-মোহামেডান খেলায় যেমন বসার জায়গা পাল্টাপাল্টি করে 'কুফা' কাটায় সেইরকম। আমার পরামর্শমতো নাম সামান্য পাল্টে যখন রেস্তোরাঁটির ব্যবসা বেশ জমে উঠলো তখন সেই অতি প্রচলিত প্রবাদটির কথা মনে পড়লো 'ঝড়ে বক মরে, ফকিরের কেরামতি বাড়ে'। এই প্রসঙ্গে একটা তথ্য দিয়ে রাখি, বাংলাদেশ টিভির এই জনপ্রিয়তা প্রথম সিরিয়ালটির একটি পর্বও কর্তৃপক্ষের কাছে জমা নেই। সব নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। তাহলে আর এতো ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রয়োজন কি! শুধু 'সকাল-সন্ধ্যা'ই নয় আগেকার কোনো ভালো প্রোগ্রামই বিটিভির সংরক্ষণে নেই। 'সত্যি সেলুকাস বিচিত্র এই দেশ।'

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন, প্রত্যেক মানুষের ভেতরে আছে তিন রকমের মানুষ। ব্যক্তিগত মানুষ, পারিবারিক মানুষ এবং সামাজিক মানুষ। 'ব্যক্তিগত আমি' ও 'পারিবারিক আমি' সম্পূর্ণ আলাদা। যখন আমি একলা, আমার নিজস্ব ভাবনা-চিন্তা নিয়ে তন্ময় তখন সেই আমির মধ্যে কোনো ফাঁকি বা ফাঁক থাকে না। কিন্তু সেই নিঃসঙ্গ আমি যখন পারিবারিক হয়ে দাঁড়াই, দায়িত্ব পালন করি, কর্তব্য পালন করি তখন কেমন সহজভাবে পাল্টে গিয়ে 'সাংসারিক' হয়ে যাই। নানা কারণে তখন দুই আমিত্বের মধ্যে সংঘাতও বাধে। একই জীবনের মধ্যে এই যে সংঘাত, দ্বন্দ্ব ও বৈচিত্র্যের সমাবেশ, অভিজ্ঞতা ছাড়া একজন অভিজ্ঞতার পক্ষে কি তার বাস্তব রূপায়ন সম্ভব? জীবন, বস্তু ও ঘটনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ছাড়া অনুকৃতি কি সফল হতে পারে? মানব চরিত্রের জটিল রহস্য যদি আমার দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, অনুভবকে ছুঁয়ে যেতে না পারে, মনের পলিমাটিতে দাগ না কাটাতে পারে, তবে বর্ণিত চরিত্রের যথাযথ রূপ কি আমি নাটকে আঁকতে পারবো? চলমান রাজনৈতিক চিত্রপট ও সামাজিক মূল্যবোধের সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারলে কি সত্যিকারের অভিনেতা হওয়া যায়? এ সবই শিখেছি দেখে, ঠেকে এবং ঠকে। শিখেছি অভিনেতা হতে হলে বাস্তব জগতের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হয়। কোনো অভিনেতাই আলাদা জগতের বাসিন্দা নন। আরো শিখেছি, অভিনয়টা জীবন- বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অভিনয় করতে হলে মানব-জীবনকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে জানতে হয়, বুঝতে হয়। যিনি মানুষের সঙ্গে মেশেন না, অন্যের মনের খবর রাখেন না, তাঁর পক্ষে সফল অভিনেতা হওয়া কঠিন। পৃথিবীর বড় বড় অভিনেতাদের জীবন ইতিহাস ঘেঁটে দেখেছি। সবাই বস্তু ও জীবন সম্বন্ধে নিজেদের অভিজ্ঞতা দিয়ে চরিত্রের তলদেশ পর্যন্ত বিশ্লেষণ করে, নিজেদের সেই অভিজ্ঞতালব্ধ বোধ দর্শককে বোঝাতে চেয়েছেন। সুতরাং, সৎ ও সৃষ্টিশীল অভিনয় শিল্পী হতে হলে সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধ থাকলে, নিজেকে অনুভূতিশূন্য যন্ত্রণা ভাবলে, আজ পর্যন্ত নমস্য অভিনেতারা যে পথে হেঁটেছেন সেই পথকেই অনুসরণ করতে হবে।

সত্যিকারের অভিনয়শিল্পী হতে গেলে জীবনে গভীরভাবে বাঁচা চাই। জীবনকে প্রতি মুহূর্তে জানা চাই। নিজের মনের দরোজাকে সম্পূর্ণ উদোম খুলে দিয়ে অজস্র অভিজ্ঞতা অর্জন করা চাই। যত বিরাট করে, গভীরভাবে জীবনকে জানা যাবে, ততই মহত্তর শিল্পের বৃক্ষ পুষ্পশোভিত হবে। তার জন্য চাই উদার খোলামেলা মন ধৈর্য আর জীবনের প্রতি মমত্ববোধ। চাই আস্থা। প্রেম ও শ্রদ্ধা। আমি এই চেষ্টাই নিয়ত করে যাই। ■